ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 916-922
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.084

তিরিশের দশক: জগদীশ গুপ্তের গল্পে স্বতন্ত্র নারী

মানালী হালদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although Rabindranath Tagore laid the foundation for the Bengali short story, after the First World War, distinct literary tendencies emerged in short fiction. These were expressed through rebellion against Rabindranath, psychoanalytic explorations of sexuality, existential despair, symbolism, and melancholy. After the war, literature and society began to break away from traditional conventions, and under the editorship of Pramatha Chowdhury, the literary magazine Sabujpatra emerged as a harbinger of change.

It was during the Kallol Era that Freud's influence penetrated Bengali literature. His psychoanalytic theories, which had already transformed European thought, crossed the seas and created a sensation in Bengali storytelling. Love was no longer seen as separate from the physical body, leading to a realistic analysis of physical love in literature. Consequently, young writers of this period began depicting primitive human societies that lived far from urban civilization, struggling with their primal desires.

This group of writers also turned their attention to the oppressed and exploited working-class and peasantry. Notably, nine short stories were published in the first volume of Kali-Kalam (1926–27), a literary magazine of the time.

One of the most powerful short story writers of the 1930s was Jagadish Gupta, a prominent contributor to Kali-Kalam. His first short story collection, Binodini (1927), created a significant stir in Bengali literary circles. Like Jatindranath Sengupta, he was deeply influenced by pessimism. While contemporary young writers sought an escape from uncertainty and disbelief through romanticism, Jagadish Gupta wandered through the corridors of doubt and skepticism. His works were rooted in realism, portraying the harsh realities of contemporary life, social contradictions, and psychological complexities. In our discussion, we will attempt to explore these aspects in greater detail.

Keywords: Post-World War I Literature, Revolt Against Rabindranath, Psychoanalysis of Sexuality, Realistic Analysis of Physical Love, Kali-Kalam Magazine, Kallol Era, Pessimistic Literature, Romanticism vs Realism

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সূচনা হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ছোটগল্প গুলিতে সাহিত্যিক প্রবণতাগুলি দেখা দিল বিশিষ্টরূপে- যার প্রকাশ ঘটল রবীন্দ্র বিদ্রোহ, যৌনমনস্তত্ব বিশ্লেষণ, জীবনসম্বন্ধে হতাশাবোধ, সাংকেতিকতা, বিষণ্ণতা প্রভৃতিতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাহিত্য ও সমাজের পুরানো গতানুগতিকতাকে ভেঙে দিয়ে প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় আর্বিভূত হয়েছিল সবুজপ্রাণের জয়বার্তা। যিনি চলিত ভাষার সাহায্যে বাংলা

ছোট গল্পে গতি দান করেছিলেন। আবার বাংলার সমাজে ও জীবনে যে জলন্ত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটেছিল তার বাস্তব রূপায়ন করে রবীন্দ্রোত্তর যুগকে চিহ্নিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আবার শরৎচন্দ্রেরও পরবর্তী যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সাহিত্যের আসরে নামলেন বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে। সেগুলি হলো 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার সমাজ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনাস্তম্ভের বাস্তব রূপায়নের মাধ্যমে ছোটগল্পে ক্রমশ আধুনিকতার চিহ্ন অঙ্কন করতে এলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখগণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে পুরাতন বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এ পর্যায়ে অবশ্য গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাস, মনীন্দ্রলাল বসুর নামও উল্লেখ করতে হয়।

একদিকে হতাশা, নৈরাশ্য ও অবক্ষয় যুব সমাজকে নাগপাশে পিষ্ট করছে, অন্যদিকে যৌবনের রোমান্টিক প্রেরণায়, যৌবনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কোন কিছুর নির্দিষ্ট প্রত্যাশা না রেখে স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রবণতায় উদ্দীপ্ত হয়ে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে যেতে চাইছে। যুব সমাজের এই প্রবণতার প্রতীক হয়ে উঠল 'কল্লোল'। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির শ্রমজীবী মানুষের ব্যথা-বেদনার কাহিনি শোনালেন। বিদ্রোহ-হল এই পর্যায়ের লেখকদের আধুনিকতার মূল মন্ত্র। তারুণ্যই হল তাদের বীজমন্ত্র। এক বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে তারা হাতিয়ার করে তুলল। জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "তাঁদের সামনে ছিল সামাজিক Taboo-র দড়িদড়া এবং তাঁদের বিদ্রোহ সেই দড়িদড়ার গ্রন্থিমোচন করে দেওয়ার দিকে নিয়োজিত ছিলো"। কল্লোল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুও বলেন- কল্লোলের অর্থই হল বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য হল পূর্বতনসাহিত্য তথা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির প্রয়াস।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগেই অনুপ্রবেশ ঘটল ফ্রয়েডের। তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব ইউরোপ থেকে সাগর পার করে এসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল বাংলা সাহিত্যে। দেহকে বাদ দিয়ে প্রেম নয়, তাই দেহবাদী প্রেমের বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাইতো এই তরুণ লেখক গোষ্ঠী তাঁদের গল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন সেই সব আদিম গোষ্ঠীর মানুষকে যারা শহুরে সভ্যতা থেকে দূরে তাদের জৈবিক কামনা-বাসনা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই লেখকগোষ্ঠীর দৃষ্টি গেল নির্যাতিত, শোষিত কৃষি বা শ্রমজীবী মানুষের উপর। ভিখারির রোজগার, কুলির জীবনের ব্যাভিচারের আশ্রয়হীনতা, দারিদ্র ও অত্যাচারে নারীর পতিতাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ের সম্ভারে বাংলা ছোটগল্প এক সমৃদ্ধরূপ লাভ করল। এযুগের ছোটগল্প স্বল্প পরিসরে বহু বিচিত্র চরিত্রের মাধ্যমে এক অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করল।

বোঝা যাচ্ছে, বাংলাসাহিত্যের নবীন সাহিত্যকগোষ্ঠী চাইছিলেন নতুন কিছু। তিরিশের দশকের ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা সেই নতুনের আগমনী ধ্বনিত করল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন- 'উদ্ধৃত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা; সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন'। কিন্তু রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ তাঁদের মধ্যে প্রবল। সেকারণেই তারা কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে অন্য পত্রিকার আশ্রয়ে ও নতুন নতুন চরিত্রের আহ্বান করলেন। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রসকলি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' গল্পগুলি বিচিত্র রোমান্সের ঢেউ আনল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠি' গল্পে সাঁওতালি মেয়ের চঞ্চল হাসির সঙ্গে কুলিজীবনের রুক্ষ দিককে তুলে ধরলেন। আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী'-র মত গল্প আমরা পেলাম।

'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন- কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। বাংলা ছোটগল্প ক্ষেত্রে কল্লোল গোষ্ঠীর দানের কথা স্মরণ করা দরকার। অচিন্ত্যকুমার আরও বলেছেন-সমস্ত দিক দিয়ে একটা নাড়া দেওয়ায় উদ্যোগ, এই উদ্যোগে উদ্যোগী তিন প্রধান তরুন- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। এঁরা ছাড়াও অন্য তরুণরাও 'কল্লোল' মাসিকপত্র ছাড়াও 'কালিকলম' (১৯২৬) ও 'প্রগতি' (১৯২৭) মাসিকপত্রেও লিখতেন। মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, জগদীশ গুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। 'কল্লোল' (১৯২৩-২৯) বন্ধ হয়ে গেলেও তার ঢেউ ছড়িয়ে যায় অনেক দূর। রবীন্দ্রনাথ- প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের রচিত গল্পধারার গতিকে মনে রাখার মত বাঁকবদল ঘটিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মনে করেন- প্রমুখ চৌধুরী প্রথম সরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল।

বাংলা ছোটগল্পের নতুন বাঁকের পথে এগিয়ে গেছেন প্রথম চৌধুরী তাঁর নিজের প্রতিভায়। সবুজপত্র ১৯১৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তারই মাঝে ১৯২৩-এ 'কল্লোলের' আর্বিভাব। শুধু কল্লোল নয়, এর সঙ্গে ছিল 'সংহতি', 'ধুপছায়া', 'বিজলী', 'কালি কলম', উত্তরা', 'বিচিত্রা', প্রগতি, প্রবাসী এবং মাসিক বসুমতীও। ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ সালে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্রমিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২২-২৩ সাল থেকে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদলের কাজে যাদের নাম যোগ হল তাঁরা হলেন নজরুল ইসলাম, শৈলবালা ঘোষজায়া এবং দুই বিভূতিভূষণ। আর ১৯২৮-২৯ থেকে যোগ করব মানিক এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। বিশ শতকের তৃতীয় দশক (১৯২০-১৯২৯) থেকে গল্পধারার যে নতুন বাঁকটি সূচিত হল তা আজও বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারা হিসাবেই বর্তমান।

বাংলার প্রগতিশীল ছোটগল্পের ধারা তিরিশ ও চল্লিশের দশকে লেখকদের কলমে পূর্ণতা পেতে লাগল। ১৯১৭-এ রুশ বিপ্লবের ফলে যেন সর্বহারা জনগোষ্ঠীর উত্থান চোখে পড়ছে। সর্বহারা, নিম্নবর্গীয় সমাজ ভিন্ন দৃষ্টিতে উঠে আসছে। যেমন-শৈলজানন্দের খনিশ্রমিক, সাঁওতাল, বাউড়ি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভাবী কেরাণী, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার সেনসগুপ্তের গ্রামীণ কৃষক, শৈলবালা ঘোষজায়ার নিরূপার্জন পরিত্যক্ত গৃহবধূ, তারাশঙ্করের বীরভূমের জনগোষ্ঠী এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরীব ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষরা। আমাদের মনে হয় এই বিশ শতকের তিরিশের দশকের যে গল্পধারা তার মূল প্রবণতা- মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণির শ্রেণিগত বৈষম্য তুলে ধরা।

জগদীশ গুপ্ত, (১৮৮৬-১৯৫৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রগামী এবং মানিকের মত তিনিও নীচুতলার মানুষের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন লেখা 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' পত্রিকায় যেমন প্রকাশিত হয়নি তেমনি জগদীশ গুপ্তর প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' সাপ্তাহিত 'বিজলী' পত্রিকায় (১৯২৫) প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য নয়টি গল্প প্রকাশিত হয় মাসিক 'কালি-কলম' এর প্রথমবর্ষে (১৯২৬-২৭) ।

ত্রিশের দশকের বাংলা ছোটগল্পের একজন শক্তিমান লেখক জগদীশ গুপ্ত। তৎকালীন 'কালি-কলম' পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক। এছাড়াও তিনি অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন। আমাদের সমাজে আপাত দৃশ্যমান ঘটনার পিছনে যে বেদনা, যে যন্ত্রণা, যে বাস্তবতা নিহিত থাকে তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। জগদীশবাবু গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা রূপায়িত করেছেন। তাইতো তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'বিনোদিনী' (১৯২৭) প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্য জগতে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর জন্ম কুষ্ঠিয়ায়। নিবাস ফরিদপুর জেলা। দারিদ্রের চাপে পরীক্ষার পড়া ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ। প্রথম তিনি শুরু করেন কবিতা দিয়ে তারপর গল্প।

কল্লোল কালিকলমের লেখক জগদীশ গুপ্ত কিন্তু মানসিকতায় ছিলেন অ-কল্লোলীয়। নিজস্ব ভাবনায়, নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনি স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। জীবনের গূঢ় সমস্যা নিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টি। তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সংশয়। সে কারণেই তিনি আধুনিক। সে কারণেই তিনি স্বতন্ত্র হয়েও কল্লোলীয়। তিনি কল্লোলের তরুণ লেখকদের থেকে প্রবীণ হয়েও কল্লোল লিখেছেন। তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত দুঃখবাদী। সমকালীন তরুণ লেখকরা যখন রোমান্টিসিজমের পাখায় ভর করে সংশয় ও অবিশ্বাসের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজছিল তিনি তখন জীবনের সংশয় ও অবিশ্বাসের গলিতে ঘুরে বেরিয়েছেন। আসলে তিনি ছিলেন একান্তভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। তাঁর 'পেয়িংগেস্ট', 'দিবসের শেষে', 'যৌবনযজ্ঞের কবি'-গল্পগুলি পাঠ করলে আমরা যেন একই পরিবারের বিভিন্ন সুবিধাবাদী, স্বার্থপর মানুষগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। যাইহোক, এখন আমরা তাঁর লেখা গল্পগুলি নিবিড় পাঠে দেখার চেষ্টা করব তাঁর সৃষ্ট নারীরা স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে কি না?

'অরূপের রাস' জগদীশ গুপ্তের এক নতুন ধরনের সৃষ্টি। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কথক কানু। কৃষ্ণের রাসলীলাকে এ গল্পের নামে প্রতীকী করে প্রয়োগ করেছেন। অরূপ শব্দের অর্থ রূপাতীত আর রাস হল আক্ষরিক অর্থে গোপনারীদের মন্ডলে কৃষ্ণরাধিকার নৃত্য উৎসব। রানু ও কানুর মিলন এ গল্পে হয়নি। কিন্তু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার স্পর্শে রানু চেয়েছে তার প্রেমকে পরিতৃপ্তি দিতে। আর সেই চাওয়ার মধ্য দিয়েই রানু হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। অভিনব ধারার গল্প 'অরূপের রাস, এ রানু ও ইন্দিরার সম্পর্কে রানুর বাঞ্ছিত রাসলীলার আভাস পাওয়া যায়। মেয়েদের সমকামিতা গল্পের মূলে অবস্থান করছে, আর তার প্রকাশ ঘটেছে রানু চরিত্রের মাধ্যমে।

গল্পের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন- 'সে সাত, আমি চোদ্দ বছরের'। দুজনে বাল্যকাল থেকে পরিচিত। রানুর বাল্যপ্রেমের অবোধ বাসনা থেকেই শেষপর্যন্ত স্বামী পুত্র নিয়ে সংসারে থেকেও যেভাবে কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে; তাতে রানু চরিত্রটি স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য এর আগে এরকম নারী চরিত্রের উপস্থিতি আমরা কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না। গল্পে রানু-র যে অদ্ভুত ব্যবহার আমরা দেখি তার মূলে কাজ করেছে রানুর বাল্যপ্রেমের বাসনা। আর সেই বাসনা থেকেই কানুর সঙ্গলাভ করার উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছে সমকামিতাকে। বাল্য এবং কৈশোরের প্রেম বিবাহিত জীবনেও অনড় থেকেছে। তাই স্বামী পুত্রসহ সংসারের পাশে রানু সঙ্গ লাভ করেছে কানু পত্নী ইন্দিরার সাহচর্যে। তাইতো গল্পের শেষে রানুর স্বামী বসন্তবাবুর বদলির খবর এলে রানু সরাসরি কানুর কাছে প্রস্তাব দেয়- 'তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।' একজন নারীর এ ধরনের প্রস্তাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় রানুর বিশেষত্ব।

ইন্দিরার সঙ্গে শয়ন করবার অভিপ্রায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে রানু বিশেষায়িত হয়েছে। আরও বেশি হয়েছে যখন ইন্দিরা শয়নকালীন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছে- 'ইন্দিরা বলিল, - যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি' আসলে ইন্দিরার শরীরে রয়েছে কানুর স্পর্শ। ইন্দিরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কানুর স্পর্শ পাওয়া যাবে এই কল্পনা থেকেই রানু বোধহয় ইন্দিরার দেহকে ব্যবহার করেছে। আবার অন্যদিকে কানুও বিষয়টিকে অনুভব করতে পেরেছে বলেই বলতে পেরেছে- "আমি তৃপ্ত"। যে নারী নিজের বাসনা পূরণে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে যে নারী তো সাধারণ নারী হতে পারে না। সে নারী বিশেষ হিসাবেই মর্যদা পায়।

রানু এক অদ্ভুত নারী। রানুর বয়স যখন দশ তখন কানুর বয়স সতেরো। দশ বছর বয়সেই রানু স্বভাবে অন্যরকম। কানু যখন তার কোমর জড়িয়ে ধরে সাধারণ কথা বলে তখন রানুর এক অদ্ভুত আড়ষ্টতা লাগে- "চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রানু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, - আর কী কী ছবি আছে দেখাও'। আসলে দশ বছরের বালিকার এ ধরনের আকালপক্কতাকে আমরা লক্ষ্য করি। সাত বছরের বড়ো হওয়ার অধিকারে কানু শাসন করার চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু রানু তখন- "আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত; - 'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বকতে বসেছে। হি হি হি...।'

দুদিনের মধ্যেই রানুর বিবাহের সংবাদে কানুর উল্লাস দেখে রানুর ক্ষোভ দেখা যায়। আসলে কানুর প্রতি রানুর যে দুর্বলতা তা কানু অনুভব করতে পারে নি। রানুর অভিমান, দুর্বলতাকে সে ক্রোধ বলে মনে করেছে। তাইতো – "একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহাতে সে হঠাৎ এমন এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পালাবার পথ পাই নাই"। রানুর বিবাহ হয়ে যায়, এবং কানুও পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে যায়। কিন্তু রানুর অভিমান বর্তমান থাকে। তাইতো কানুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে রানু বলে- 'তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও'। এই কথায় আমাদের মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনীর কথা।

নায়িকা রানুর এক অদ্ভুত আচরণ, তাইতো অদ্ভুত সখিত্বে কাছে টানে ইন্দিরাকে। রানু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বটে। গল্পের শেষ দিকে তাই আমরা দেখি বাবা- মাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ স্বামী বসন্তবাবু ও শিশু পুত্রকে নিয়ে সফল গৃহিণী সে। কিন্তু তার মধ্যেই সে নিজের সন্তান বেনুকে সামনে রেখে ইন্দিরার সন্তানের বাসনাকে তীব্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়, 'আয় বৌ তুই আমি এক হয়ে যাই'। এই ধরনের প্রস্তাবে, সমকামিতায় নিজে স্বামী হয়ে স্ত্রীর ভূমিকায় ইন্দিরাকে বসায়, এবং ইন্দিরার শরীরের মধ্যে থাকা কানুর দেওয়া উত্তেজনা, আনন্দ, উত্তাপকে নিজের শরীরের কামনা-বাসনার গভীর খাদ ভরাট করতে চায়। অন্য নারীর মধ্য দিয়ে প্রেমিকের প্রেমকে চিরন্তন করে রাখার চেষ্টা বাংলা ছোটগল্পের নারী চরিত্রে দুর্লভ। রানু সে কারণে এক জটিল নারী, সাধারণ সংসারী নারী হয়েও এভাবে নিজের কামনা চরিতার্থতায় যে বিচিত্র পন্থা অবলম্বনকারী সে নারীতো সাধারণ হতে পারে না। সে নারী বিশেষের দাবীদার। সে নারী স্বতন্ত্র, যার সাথে অন্য কারোর তুলনা চলে না।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটি 'মেঘাবৃত অশনি' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পটির নামকরণে বিরোধাভাস এর কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পটি ত্রয়ী চরিত্র কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। অকুল-অভয়া-শান্তি–এই তিন-নর-নারীর জীবনের সম্পর্কের কথা কাহিনির স্তর অনুযায়ী অনাবৃত হয়েছে। আর সেই সম্পর্কের সূত্রেই আমরা খুঁজে নেব এমন এক

নারীকে যে নিজ গুণে হয়ে উঠবে অনন্যা। গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়তো অভয়া। সমগ্র গল্পে অভয়ার শঙ্কা, ভয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনটি চরিত্রের ত্রিভুজ অবয়বে এক গোপন দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গল্পপাঠে আমাদের মনে হয়েছে কেন্দ্রিয় চরিত্র অভয়া হলেও, অভয়ার মাতৃহৃদয় কন্যা শান্তিকে নিয়ে শঙ্কিত থাকলেও অভয়ার আত্মজা শান্তি চরিত্রটি কোথায় যেন আলাদা হবার দাবীদার। কারন মাতৃহৃদয় এমনই হয়, যে কিনা সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। অভয়া ও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু গল্পপাঠে দেখি অভয়ার আত্মজা শান্তি নামক মেয়েটি কত আলাদা। সে কত প্রানখোলা, সহজ এবং বুদ্ধিমতী।

প্রথমে অনুচ্ছেদেই দেখা যায় মা অভয়ার মানসিক উৎকণ্ঠা এবং অসাহয়তা মূর্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত গল্পের শেষ পর্যায়ে অভয়া ও অতুলের গোপন সম্পর্কের কথা মেয়ে শান্তির কাছে ফাঁস হয়ে যায়। তা শুনে শান্তির সক্রিয়তা অনেক বেশি প্রসারিত মনে হয়। গল্পটি তিনটি চরিত্রের মনোধর্মের টানাপোড়েনে নিঁখুত। মেয়ে সপ্তদশ বর্ষীয়া শান্তি সুশ্রী, তন্বী, শারীরিক গঠনে পূর্ণরূপা এবং চঞ্চল। মেয়ের এই সৌন্দর্যে মা অভয়া উদ্বিগ্ন। মেয়ে বেশি হাসিখুশি হলে যে কোনো মায়ের দুশ্চিন্তা করা স্বাভাবিক। আবার শান্তির নানা বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনাও যেন উদ্ভট মনে হয়। আশরীরী প্রেম, পরকীয়া প্রেম, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন যৌনতা, চুম্বন এসব নিয়ে শান্তি বাবার সঙ্গে তর্ক করে- 'গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চায়, বাবা, তা কি সম্ভব?' বাবার কাছে মেয়ের এ ধরনের জানতে চাওয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু আমরা শান্তিকে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে বুঝব শান্তি আসলে অনেক আধুনিক মনস্ক। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক সপ্তদশবর্ষী নারী। যার মনে কোন সংকোচ নেই। যার কোন ভয় নেই, যে উচ্ছল এবং মনের দিক থেকে অনেকবেশি আধুনিক। তাইতো সে অবলীলায় বাবার কাছে যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন রাখতে পারে। একজন মুক্তমনা নারী কিভাবে তার প্রশ্নগুলোকে বাবার সামনে ছুড়ে দিতে পারে তা শান্তিকে দেখলেই বোঝা যায়। তাইতো শান্তি মায়ের কথার প্রতিবাদ করে বলে- "মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে- '...মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিস্কার স্বচ্ছ থাকে; যতো গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টমি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন? শিক্ষা নেবো না?"

শান্তির এই উক্তি থেকেই আমরা অনুভব করতে পারি শান্তি কতটা স্বতন্ত্র একটি নারী। আবার সে যে প্রতিবাদী একটি নারী সেটাও তার এই উক্তিতে পরিস্ফুট হয়। পিতা-পুত্রীর আলোচনার মাঝে-এসে মা শাসনের অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই পুত্রী শান্তি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শান্তির আত্মবিকাশ আমাদেরকে যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দেয়। শান্তি মায়ের কাছে জানতে চায় কেন, তার বাবা-মা নিজেদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের থেকে নির্বাসিত জীবন কাটায়। সে শুধুমাত্র প্রতিবাদী-ই নয়; সে শিক্ষাদাত্রী ও বটে। তাইতো সে বাবাকে এসরাজ বাজানো শিখিয়েছে। এবং নিজেও বাবার সামনে মুক্ত নাচের অফুরন্ত তালিম দিতে পিছপা হয় নি।

রাস্তায় একদিন বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক ভদ্রলোকের সম্মুখীন হয় এবং বাবার তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখে শান্তির মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু বুদ্ধিমতী শান্তি বাবাকে তাঁর অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে। শান্তির খোলামেলা মনোভাব এবং চাপল্য স্বভাব এর জন্য তার মা অভয়া কেমন যেন দুশ্চিন্তায় থাকে। আমাদের হয়ত মনে হতে পারে অতুল এবং শান্তির যে সম্পর্ক তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা-র রেখা রয়েছে। যে রেখা-র কথা সবসময় মনে করেছে অভয়া। তাইতো মা হিসাবে অভয়া শঙ্কিত থেকেছে, কিন্তু মেয়ের কাছে তো বাবা শিখতেই পাবে। আর সেই মেয়ে যদি হয় শান্তির মতো আধুনিক মনস্কা।

সেদিন অতুল মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় যায় ও দেরি করে বাড়ি ফেরে। সেই দিনই অভয়া অতুলের চরিত্র দোষের কথা তোলে। মেয়ের সামনেই অভয়ার সন্দেহ-এক বিকৃত রূপ ধারণ করে। সরল নিশ্চুপ শান্তির সন্দেহ চরমে ওঠে। মায়ের সবসময় বাবাকে সন্দেহ করার কারন বুদ্ধিমতী শান্তি অনুভব করতে পারে। তাই সে মাকে ডেকে বলে- 'তোমাদের সব কথা আমি বুঝলাম না কিছুই; কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা দুঃখের – তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে বলে, ভয়, করছ। সেটা কী মা? বাবার কি চরিত্র দোষ ছিলো?' কতটা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন হলে এই অনুভব হয় তা শান্তি আমাদের বুঝিয়ে দেয়। শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী, আধুনিকমনস্ক নারীমন অনুভব করতে পারে মায়ের সন্দেহের মূল কোথায় নিহিত।

'মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?- শান্তির এই জিজ্ঞাসা শাণিত প্রতিবাদের ভাষা। মেয়ে যত বড় হতে থাকে, তার সঙ্গে বাবা মায়ের বন্ধুর মতো ব্যবহার করা উচিত, এটাই আধুনিকতম জীবনসত্য। আর সেই সত্য বিশ্বাসী শান্তি

কিন্তু বাবার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করেছে। প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে শান্তি নিজের স্বতন্ত্রতাকে প্রতিষ্ঠিতই করেছে। নিজেদের পরিববারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেও যেন শান্তি নিজ চরিত্রের বিশেষত্বের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে শান্তি-না হয়ে যদি অন্য কোন নারী চরিত্র উপস্থিত থাকলে বোধহয় নিজ পরিবারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারতো না। এমনকি বাবার চরিত্র নিয়ে সন্দেহের জায়গা যদি তৈরিও হয় সেটা যে মেয়ের কাছে খুলে বলা উচিত সে সম্পর্কেও মাকে অভিযোগ করতে সে দ্বিধান্বিত হয়নি। কতটা প্রতিবাদী হলে একজন মেয়ে মাকে বলতে পারে- 'বাবার চরিত্র কু হলেও সে ইঙ্গিত বারবার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ, আমাকে জানানো উচিত নয়'। বাবার চরিত্র প্রসঙ্গে কোন সংশয়ে থাকতে সে চায় না। সে চায়, সে সংশয়ের খোলাখুলি সমাধান। কতটা প্রসারিত মনের ও মার্জিত বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হলে একজন মেয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় তা অনুভবনীয়। এসব ব্যাখ্যাতেই শান্তি সমগ্র গল্পে হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

গল্পের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দেখি সদা জিজ্ঞাসু শান্তিকে যখন তার মা অগভীর ঘুম থেকে তুলে প্রশ্ন করে- 'বল সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করে নি তো?'- এ প্রশ্ন শুনে সদা জিজ্ঞাসু শান্তি স্তম্ভিত হয়ে যায়। তবুও সে চুপ না থেকে বলতে শোনা যায়- 'বাবা চরিত্রহীন, একথা তুমি অনেকবার বলেছ, কিন্তু এ কী কথা তোমার মুখে!' আসলে শান্তি একেবারে আলাদা সপ্তদশী। তার প্রশ্ন, সারল্য, আত্মগত জিজ্ঞাসা এবং সর্বোপরি প্রতিবাদ চরিত্রটিকে ক্রমশ অন্য মাত্রা দেয়। শান্তি অতুলের মেয়ে নয়, তার নিজের বাবা হল অভয়ার প্রথম স্বামী। এই নির্মম সত্যটা জেনেও শান্তি যেভাবে অভিজ্ঞ হয়েছে তাতে তার সারল্যের দ্যুতির মধ্যে দিয়েও সতর্ক, সপ্রশ্ন এবং সহনশীলতার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করে। সপ্তদর্শী শান্তিময়ী, সে কতটা ব্যক্তিত্বময়ী নারী হতে পারে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। শান্তির এই যে পরিণত ছবি ও তার সক্রিয়তা ক্রমশ তাকে আধুনিকোতম একজন সত্যিকারের নারীব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সেদিক থেকে শান্তি হয়ে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

পরবর্তী আলোচিত গল্প 'হাড়' গল্পটি 'শঙ্কিতা অভয়া' 'গল্পের প্রায় পাশাপাশি লেখা। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর লেখা 'হাড়' গল্পটির প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। যদিও সেখানে আমরা দেখতে পাই বিশ-শতকের তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচ্য জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পটিতে আমরা ডাইনি প্রসঙ্গ দেখতে পাই। এই ডাইনি প্রসঙ্গ নিয়েও গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী অধ্যুষিত জীবন চর্যায় ডাইনির গল্প লেখেন। জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পে ডাইনির প্রতিক্রিয়ার কথা থাকলেও নিয়তির ফল নায়কের জীবনের দুর্ভাগ্য হিসাবে উপস্থিত। ডাইনি বা নিয়তির প্রসঙ্গ থাকলেও গল্পে 'রসি' নামক নারী চরিত্রটি কিভাবে 'মাসি'র দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর সেটাই আমরা দেখার চেষ্টা করবো। কারণ রক্ষা মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিল যে- 'মাসি, দেখো মথুরকে; যেন বাপের মতো না হয়।" এই কথার পরে নারীর মাতৃহৃদয় অপমানিত হয়েও মায়ের দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। একজন সন্তানের কাছে মায়ের পরেই তো মাসি মায়ের স্থান দখল করে।

গল্পের শুরু হয় 'রক্ষা'-র মৃত্যু দিয়ে। সেই মৃত্যু রহস্যজনক– কিনা সেটা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও, প্রশ্ন করল রসি। কারণ রসিকে যে মাসি বলে ডাকত রক্ষা। রসির হাড়ে জোর নেই। মুখেও দন্ত নেই, কিন্তু মনের জোর বেজায়। রক্ষার দুঃখে রসি কেঁদে বেড়ায়। কারণ রসি ও রক্ষার মধ্যে যে মমত্বের সম্পর্ক ছিল। তাইতো রক্ষা মরার সময় বলে মথুরকে বাপের মত না করতে। সনাতন রক্ষার স্বামী। সে কিন্তু রশ্মিকে ডাইনী বলে অপমান করতে থাকে, তাকে দেখলে থুতু ফেলে। রসি কিন্তু আসলে ডাইনি নয়। সে বরং এ সবকিছুর তীব্র প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না। সনাতন যখন তাকে গালাগালি দেয় তখন রসি কাঁদে না। বরং তার মাতৃহৃদয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। তাইতো- 'রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো। ....ইহজন্মে রসিকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই... কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই....তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে- এ যে বড়ো লোভের জিনিস।' রসির এই যে অনুভব তা জীবন্ত, তা বিশুদ্ধ এবং মানবিক। এই মানবিকতাবোধ -ই রসিকে নারী হিসাবে বিশিষ্ট করে তোলে।

রসি বোঝে ছেলের অধিকার আগে বাবার। তাই মথুরকে নিতে গেলে তো সনাতনের অনুমতিও দরকার। এই যে ন্যায়ের বিচার রসির আছে তা তো সবার থাকে না। সনাতন একজন জেলখাটা, বেপরোয়া, দাম্ভিক বাবা। সে তো রসিকে ছেলেকে মানুষের অনুমতি দেয় না। বরং তাকে 'মাগি ডাইনি' বলে গালাগাল দিতেও ছাড়ে না। সেই অপমানে রসি অপমানিত হয় না। বরং মনে মনে সে জ্বলতে থাকে।। এটা আসলে রসির ভারসাম্যপূর্ণ এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যা রসিকে সকলের মাঝে আলাদা করে তোলে। তাইতো বিপদে, অপমানে, আঘাতে সে নীরব থাকতে জানে।

সমগ্র গল্পে দেখি সনাতন একজন বেপরোয়া পুরুষ। পৌরুষের অধিকারে নিজের ছ'বছরের সন্তান মুথুরকে কাছে রাখতে চায়। তাই সে গ্রামের মজলিশের কোন কথা শোনে না' চাটুজ্যে মশায়ের বুদ্ধি নেয় না। রসির একান্ত আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎখাত করে দেয় এবং তাকে আটকুড়ি, ডাইনি বলে অপবাদ দিতে থাকে। কিন্তু রসি নিজ ব্যক্তিত্বে অটল থাকে। একদিন সনাতন যখন মাছ ধরতে যাবার জন্য বার হয় তখন রসি বলে- 'তুই মাছ ধরতে চলেছিস, ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।' এই কথা রসি হয়ত বলে' ঠিকই, কিন্তু এ কথা কোনো অভিশাপ নয়। কিন্তু ভাগ্যের চক্রে সনাতন কিন্তু শেষপর্যন্ত মারাও যায়। মাছশিকারে যাওয়ার সময় তার সঙ্গী ভুবন তার সঙ্গ দেয় না। এবং গাছের মতো বিশাল মাছ পেয়েও সনাতন কিন্তু মাছ নৌকায় তুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ঘটনার আবর্তে ছেলে মথুরকে নিয়ে আনন্দ সহকারে মাছ ভাত খাবার সময় সাবধান থাকা সত্ত্বেও শ্বাসনালীর মুখে মাছের হাড়ের চাপ অনুভব করতে থাকে। হাড়ের বাধায় অসহায় চিৎকারের মধ্যেই সনাতনের মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যের পরিহাসে, নিয়তির আঘাতে সনাতন মারা গেলে রসি এসে উপস্থিত হয়- 'রসিও আসিয়াছিল, অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।'

সনাতনের এই পরিণতির জন্য ডাইনি রসির অবশ্য কোন উচ্ছ্বাস বা উল্লাস ফুটে ওঠেনি। আসলে নীরবতাই তার অলংকার। সে তো ডাইনি নয়, সেতো মাতৃরূপিনি এক নারী। মানবিক ও সন্তানকামনায় কাতর এক নারী। প্রতি মুহূর্তে সে ডাইনি অপবাদে পরিচিত হতে থাকলেও তার নীরবতার মধ্য দিয়ে যে আত্ম সংযম এবং মাতৃত্বের গভীরতায় পরিপূর্ণ হতে থাকে। আর এই সামাজিক প্রতিকুল পরিবেশে যেভাবে নিজেকে নীরব রেখে এই অপাবাদের প্রতিবাদ করে গেছে তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে। তার এই নীরবতাই তার নারীসুলভ মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটায়। আর এভাবেই রসি হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী এক নারী।

তথ্যসূত্র:

১। সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা-১৫৪
২। সেনগুপ্, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, পৃষ্ঠা-৩০
৩। চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯
৪। জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলি-৭৩।
৫। দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, ২৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।
৬। মিত্র, ড. সরোজমোহন, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি-০৯
৭। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, বামা পুস্তকালয়, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলি-৭৩।